Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.51-59
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনভাষ্যঃ কালিপদ চক্রবর্তীর ছোটগল্প

ড. মৌসুমী পাল
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:

The lower class consciousness is observed in the stories of the storyteller Kalipada Chakraborty. Tripura's storyteller has chosen Tripura as his backdrop. Committed to society, believing in hardworking people, the storyteller has been a lifelong fighter. He did not weep luxuriantly for the lower class people, but because he had a sincere sympathy for the proletariat, he easily shared in their joys and sorrows. He remained responsible towards the oppressed, deprived people. The storyteller has highlighted in his story the life struggle of those who have to become destitute due to the loss of economic balance.

Storyteller, Kalipada Chakraborty constructs his story using the perspective of eternal sympathy for real Dalit people. People from this lower strata of society are constantly struggling to maintain their existence. They have to face multifaceted experiences in the struggle for survival. They have to be endangered in various ways to protect their foothold.

Storyteller, Kalipada Chakraborty started writing at the very beginning of the seventies. His first book of stories 'Bikeler Maidan' was published in 1983 with eight stories from the stories he wrote over two decades. Later, his selected stories were published in 1998 with some additions and deletions. His stories include 'Tir', 'Gangadharer Upakhyan', 'Shiyal', 'Samayer Haat', 'Ashraydatri', 'Prabandha', 'Khun', 'Trishankar', 'Swargagaman', 'Dinalipi', 'Nishana', 'Swad'.

Although Kalipada Chakraborty's writings are limited in number, protest, resistance, consciousness and devotion are present in his stories. Kalipada Chakraborty is the author of biographies of lower class people. In his story, we see the nature of the multifaceted struggle for survival. He wrote stories about the life struggles of the lower class people.

Keywords: lower class consciousness, struggle for life, struggle for existence, protest, resistance.

সাহিত্য হচ্ছে একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। যে দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সে জীবন ও জগতকে দেখে এবং ব্যাখ্যা করে। ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার কালিপদ চক্রবর্তী নীচু তলার মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনযন্ত্রণাকে তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই

মানুষদের দুঃখ, যন্ত্রণা, বর্ণ ও শ্রেণিশোষণের চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সাহিত্যে। তিনি দূর থেকে নিম্নবর্গের মানুষদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে দেখেননি অথবা লাইব্রেরীতে বসে সাহিত্যচর্চা করেননি। বরং জনজাতিদের নিজস্ব পরিসরে গিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করার পরই তিনি তাদের অভাব অভিযোগকে সাহিত্যের বিষয় করে তোলেন। মূলত অভিজ্ঞতাই তাঁর লেখার মূল রসদ।

সমাজের প্রতি অঙ্গীকারে, মেহনতী মানুষের প্রতি বিশ্বাসে, গল্পকার আজীবন সংগ্রামী থেকেছেন। নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে তিনি বিলাসীর কান্না করেননি, বরং সর্বহারা গোষ্ঠীর প্রতি তার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল বলেই তিনি অনায়াসে তাদের সুখ-দুঃখের মধ্যে শামিল হয়েছিলেন। তিনি দায়বদ্ধ থেকেছেন নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের প্রতি। অর্থনীতির ভারসাম্য হারিয়ে যাদের নিঃস্ব হয়ে যেতে হয় তাদের জীবনসংগ্রামকে গল্পকার তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। নিম্নবর্গের এই মানুষেরা দিনরাত খেটে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। তারা যদি ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চায় তাহলে সমাজের সুশাসকরা তাদের চিরতরে নীরব করে দিতেও পিছপা হয় না।

বাস্তবিক দলিত মানুষদের প্রতি অনন্ত সহানুভূতির দৃষ্টিকোণকে ব্যবহার করে গল্পকার কালিপদ চক্রবর্তী তাঁর গল্প নির্মাণ করেন। সমাজের এই নিচু তলার মানুষগুলি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলছে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে তাদের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। নিজেদের পা রাখার জমিটুকু রক্ষা করার জন্য তাদের নানাভাবে বিপন্ন হতে হয়। সারাদিন পরিশ্রম করে মজুরি না পেয়ে উপোস থাকতে হয়। উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়ার জন্য তারা তাদের সামান্য চাহিদাটুকুও পূরণ করতে পারে না।

অন্যদিকে কৃষকরা রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ফসল ফলায়। কিন্তু তাদের এই ফসলে নিজেদেরই কোন অধিকার থাকে না। মহাজনের সুদ দিতে গিয়েই তারা নিঃস্ব হয়ে যায়। সংসারের জন্য তারা নিজের শ্রম বিলায়। তীব্র প্রতিকূলতাকে প্রতিরোধ করতে তারা সর্বদা তৎপর থাকে। এই নিম্নবর্গীয় মানুষেরা সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের কাছে সর্বদাই অবহেলিত। কালিপদ চক্রবর্তীর গল্পগুলিতে গল্পকারের নিম্নবর্গীয় চেতনা পরিলক্ষিত। ত্রিপুরার গল্পকার তাঁর পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছেন ত্রিপুরাকেই। তাঁর গল্পগুলিতে ত্রিপুরার জনজাতিদের জীবনকথাও বিবৃত হয়েছে।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার কালিপদ চক্রবর্তী সাতের দশকের একেবারে শুরুতেই লিখতে শুরু করেন। দুই দশক জুড়ে যেসব গল্প লিখেছেন তা থেকে আটটি গল্প নিয়ে ১৯৮৩ সালে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিকেলের ময়দান' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে কিছু গল্প সংযোজন ও বিয়োজন করে ১৯৯৮ সালে তাঁর 'নির্বাচিত গল্প' প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'তীর', 'গঙ্গাধরের উপাখ্যান', 'শিয়াল', 'সময়ের হাত', 'আশ্রয়দাত্রী', 'প্রবন্ধ', 'খুন', 'ত্রিশঙ্কর', 'স্বর্গগমন', 'দিনলিপি', 'নিশানা', 'স্বাদ'। সংখ্যার নিরিখে কালিপদ চক্রবর্তীর লেখা সীমিত হলেও প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, চেতনা ও নিষ্ঠা তাঁর গল্পগুলিতে বর্তমান।

সনাতন শ্রেণিভেদ, বর্ণভেদের বাইরে নতুন যে ভেদের প্রাচীর তা ক্রমশই বিশাল এবং দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে, সাধারণ মানুষের দিনগত পাপ অবক্ষয়ের মত জীবনযাপনের খুঁটিনাটি দিকগুলি তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ গল্পের চরিত্ররা উঠে এসেছে প্রতিদিনের পরিচিত পরিবেশ থেকে। যাদের আমরা প্রতিনিয়ত দেখি, কিন্তু লক্ষ্য করি না। গল্পকারের নিজের চরিত্রগুলো সম্পর্কে অতৃপ্তি ছিল। তাই

তিনি বলেছেন –"লেখা নিয়ে অতৃপ্তি প্রত্যেক লেখকেরই থাকে, আমারও আছে। হয়তো বেশিমাত্রায়। যার নিট ফল গল্পের স্বল্পতা।"[১]

গল্পকার কালিপদ চক্রবর্তী 'তীর' গল্পটি ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার মাটি এই গল্পের ভিত্তি। এই মাটিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বহিরাগত এক শ্রেণীর কুলি মজুর শ্রমিকরাও বসবাস করতে শুরু করেছিল। শতাব্দীকাল আগে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এই রাজ্যের চা বাগানগুলোতে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্তির জন্য এদের আনা হয়েছিল। চা বাগানগুলোকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে এরা। এই রাজ্যের চা বাগানগুলোর অভ্যন্তরে এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নিম্নবর্গ জন সম্প্রদায়ের দ্বি-পাদ ভূমির জন্য যে যুদ্ধ তাকে অবলম্বন করেই এই গল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'তীর' গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই ষষ্ঠীচরণ শ্রীপুর চা বাগানের ঠিকা শ্রমিক। চা বাগানের নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত কাজ করার পর তার আর কোন কাজ থাকে না। তার মত অনেক শ্রমিকই একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য কর্মহীন হয়ে পড়ে। তখন অন্য ধরনের কাজ না করলে চলে না। কোন কোন চা শ্রমিক চা বাগানের সীমানাতেই জমি চাষের কাজ করে। অদৃশ্য এক বিবেকী দায়বদ্ধতাও যেন চা বাগানের চৌহদ্দিতে থাকতে বাধ্য করে তাদের। সব জেনে বুঝেই ষষ্ঠীচরণ জমি বর্গা নিয়েছে ম্যানেজারের কাছ থেকে। ষষ্ঠী তাঁর শ্রম অকাতরে লুটিয়ে দেয় জমিতে।

ষষ্ঠীকে ম্যানেজার যে জমি বরাদ্দ করেছিল, সেটি তেমন উর্বর ছিল না। তবে প্রাথমিক অবস্থায় এখানে ফসল ফলে না। ষষ্ঠী বছর দুয়েক পরিশ্রম করে চাষের উপযুক্ত জমি তৈরি করে। মাটি তৈরি করতে এসে বিস্তর কষ্ট করেছে সে –"জউল্যা মাডি, ইয়া মুডা মুডা জুক, ধরইল্যে ছারান নাই। আর বন সা সা কইরা গাছ বারে, হাল চলে না হুজুর, গাছের গুড়া হাবাল মাইরা চাইর দিয়া তুলতেই অয়, কুদাল কুবাইতে অয়।"[২] এই অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করে তোলার জন্য তার সংগ্রামী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠী জড়ান বড় মমতায় আর প্রচন্ড পরিশ্রমে একটু একটু করে জমিকে শস্য প্রদানে শক্তির করে গড়ে তোলে।

জমি নির্মাণ যেহেতু সুসম্পন্ন হয়েছে এখন জমিতে ফসল প্রদান করবে এমন প্রত্যাশা নিয়ে ষষ্ঠীচরণেরা সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এগিয়ে চলেছে। আর প্রত্যাশা সামনে তথাপি কণ্ঠস্বর বরাবরই পাহাড় প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ায় ষষ্ঠীচরণ। রং দিয়ে ফসল ফলাচ্ছে কিন্তু ফসলের মালিক তার হবার সুযোগ নেই। কিন্তু বর্তমান রচনায় ষষ্ঠী জমির আধিপত্য হারাতে চলেছে। এমনই একটা আবহে গল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন গল্পকার। ঘটনার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিচরিত্রগুলিকেও চিহ্নিত করেছেন তিনি।

ম্যানেজার তার আধিপত্যের জোরে দলভুক্ত করে নিয়েছে কিছু শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকেও। এদের আচরণও ষষ্ঠীচরণদের বিপ্রতীপে অবস্থান করে। বহুবাচনিক 'ম্যানেজাররা' উচ্চারণে শ্রেণি শক্তিকেই ইঙ্গিত করেছেন গল্পকার। ষষ্ঠীচরণ এত যত্নে জমিটাকে তৈরি করেছে। কিছুতেই সে এই জমি ম্যানেজারের হাতে তুলে দিতে পারেনা – "তার (ষষ্ঠীচরণের) যত হবিতম্বি বিঘা কয়েক জমিটাকে ঘিরেই। এক ম্যানেজার তার দলবল বাদে এ তল্লাটে বোধ হয় কেউ তার শত্রু নেই।"[৩] এখানে সমস্যার উৎস সমস্যার স্রষ্টারাও রয়েছে সৃষ্টিকে দেখার সুযোগ আমরা পেয়ে যাই।

ম্যানেজার ফসলসহ জমি নিজের অধিকার নিয়ে নিতে চাইলে ষষ্ঠীচরণ বলে – "আমার দান কাইট্যা নিতে আইব, আমি চাইয়া দেহুম? চাইয়া?"[৪] ষষ্ঠীচরণ জমি হাতছাড়া করবে না। আবার ম্যানেজারও জমিটি

নিজের অধিকারে নিতে চান। তাই ম্যানেজার দলবল নিয়ে জমি দখল করতে আসে। ম্যানেজারের পোষা কুকুর বুধনও সঙ্গে এসেছে। ম্যানেজারের নির্দেশে নিজের হাতে তৈরি তীর মেরে বিদ্ধ করেছে ষষ্ঠীকে। তীরটাই প্রমাণ, এটি বুধনের হাতে তৈরি। ষষ্ঠীর গায়ে তীর বিঁধে রয়েছে - এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কি হতে পারে।

ষষ্ঠীচরণের ধারণা দারোগাবাবু সত্য বিচার করবেন। এতদিন শুধু সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব ছিল। এবার ষষ্ঠী নিজেই সাক্ষ্য বহন করছে। ষষ্ঠীর উপর অত্যাচার চলছে। হাতেনাতে প্রমাণ তুলে ধরে তার বিচার পেতে চায় ষষ্ঠী। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন জমিতে ফসল হয়েছে তখনই ম্যানেজার অধিক মুনাফার জন্য এই জমি হাত করতে চাইছে। কিন্তু ম্যানেজার সম্পর্কিত কোন অভিযোগই দারোগাবাবু এতদিন কানে নেয়নি। সাক্ষ্য দিতে কেউ রাজি নয়। প্রমাণ না নিয়ে কোন অভিযোগ দারোগাবাবু নথিভুক্ত করবে না।

ষষ্ঠীচরণ সম্পর্কে দারোগাবাবুর সুস্পষ্ট ভাবনার প্রকাশও গল্পকার তুলে ধরেছেন – "ষষ্ঠীর শরীর যথেষ্ট শক্তি আছে। আরো দু'এক ঘন্টা তীরটা বের না করলেও কিছু হবে না। আপনিই ব্যাটা এক সময় খুলে নেবে। আর খুলে না নিলেই বা তার কী করার আছে।?"[৫] ষষ্ঠীচরণও ক্রমশ একসময় দারোগাবাবুর অনবদ্য চরিত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ষষ্ঠীচরণ অপেক্ষা করতে থাকে কখন তার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হবে – "রোদের দিকে চেয়ে দারোগাবাবু হেসে উঠলেন। তার রিপোর্ট শেষ হয়েছে, বেশ ভালোভাবেই তৈরি হয়েছে সব।"[৬]

দারোগাবাবুর হাসিতে সে বুঝতে পারল তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তার অভিযোগ লেখা হবে না। প্রতিবাদী ষষ্ঠীর একটাই চাহিদা ন্যায় বিচার। তাই শরীরের যন্ত্রণা আর বিচার অপ্রাপ্তির জন্য বেদনাবোধ নিয়ে ষষ্ঠী উচ্চ বিচারালয়ের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। কিন্তু লাল দেয়ালে ঘেরাও করা ইট-কাঠ-পাথরের নির্মিত বিচারালয়ে প্রবেশের জটিল পথ ষষ্ঠীচরণ জানে না। এর অভ্যন্তরে কত সহস্র প্রক্রিয়া লুকিয়ে রয়েছে তা শ্রমিক তথা নিম্নবর্গীয় মানুষ ষষ্ঠীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু ষষ্ঠীর লক্ষ্য একটাই – "হাকিম, দন্ডমুন্ডের কর্তা তিনি, ন্যায় অন্যায় বিচার করেন, তিনি নিশ্চয়ই ষষ্ঠীর কথা বুঝবেন। একটানা বারো মাইল পথ রোদের মধ্যে হেঁটে ষষ্ঠী শহরে এসে পৌঁছায় হাকিমের কাছে তার আর্জি পেশ করতে।"[৭]

ষষ্ঠী শেষ পর্যন্ত আদালত চত্বরে এসে হাজির হলো। কিন্তু এবার ষষ্ঠী থমকে পড়েছে। বিচার তো এজলাসে নেই। তার অভিযোগ কার কাছে তুলে ধরবে সে। প্রতিবাদী, বিদ্রোহী নিম্নবর্গীয় ষষ্ঠীচরণের বিচারের দাবি আদালতের উঁচু চেয়ারে বসে থাকা বিচারকের টেবিল পর্যন্ত পৌঁছল না। ষষ্ঠীদের জয়ের ইতিহাস আজও লিখিত হয়নি। ষষ্ঠীরা তাই এক পরাজিতের অবনমিত পতাকা বহন করছে। প্রতিবাদী নিম্নবর্গের ভাগ্যলিখনের চিরন্তনত্বই গল্পকার 'তীর' গল্পে নতুন ছাঁচে ফেলে আমাদের শুনিয়েছেন।

গল্পকার কালিপদ চক্রবর্তী তাঁর গল্পে সেইসব মানুষদের দুঃখ, বেদনা, সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও পরাজয়ের অনবদ্য আলেখ্য রচনা করেছেন। অধ্যাপক মঞ্জরী চৌধুরী লিখেছেন- "তীর' গল্পটি কালিপদের লেখকসত্তাকে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয়।"[৮] গল্পে প্রতিষ্ঠিত আধিপত্যের বিপ্রতীপে বিকল্প আধিপত্যের অন্তহীন সংগ্রামের ইতিহাসকে সাহিত্যের প্রতিবেদনে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। সাহিত্যের বয়ানে নিম্নবর্গীয় চেতনার পাঠ গ্রহণই বর্তমানের আলোচনার অভীষ্ট।

'তীর' গল্পটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেখানে ভূমি সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গল্পকার কালিপদ চক্রবর্তীর 'গঙ্গাধরের উপাখ্যান' গল্পেও ভূমিজনিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ও তৎকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে। গল্পটি ১৯৭৮ সালে লিখিত হয়েছিল। ত্রিপুরার প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। তার দু'বছর বাদেই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়াবহ স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সরকার উদাসীন হয়েই রাজ্যের প্রগতির লক্ষ্যে বহু কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে বিশেষভাবে অপারেশন বর্গা গুরুত্ব পেয়েছিল। এই কর্মসূচিতে যে ভ্রান্তি ছিল গল্পকার তাকেও বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বর্ণনা করেছেন।

গল্পের শুরুতেই গল্পকথকের জবানী থেকে গঙ্গাধরের একটি বাহ্যচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন – "গঙ্গাধরের পরনে সন্ন্যাসী মার্কা লাল কাপড়, পায়ে পাম্প সু।"[৯] গঙ্গাধর মানুষের মন পাঠ করতে জানেন। সাধারণ মানুষ গঙ্গাধরের কাছে নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে চায়। মানুষের প্রতি ভালোবাসা গঙ্গাধরকে তাড়িত করেছে। হৃদয়ের এই অনুভূতি গল্পকথাকেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। একই সঙ্গে চরিত্রটির বিচিত্র স্বরূপও ক্রমান্বয়ে গল্পকার তুলে ধরেছেন। ঘটনা পরম্পরায় তার প্রকাশ ঘটেছে।

একজন সংসারী গঙ্গাধরকে গল্পকার জানতেন। তাই গঙ্গাধরের সন্ন্যাসী রূপ দেখে যখন গল্পকথক জিজ্ঞাসা করলেন এই বেশ ধরার কারণ কি। তখন সে বলে – "সন্ন্যেসি হয়ে দেখছি কেমন লাগে?"[১০] এ হচ্ছে বিচিত্র গঙ্গাধর। যে কিনা মাঝে মাঝেই বেশ বদলে নতুন বেশ ধরে। গঙ্গাধরের বিষয় আশয় মন্দ ছিল না। তার ভাইদের সম্মিলিত চেষ্টায় বেড়েছেও। তার আয় থেকে লোহালক্করের দোকানও দাঁড়িয়ে গেছে। তারপরেই এলো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি। তখন রাজ্যে নতুন পরিস্থিতিতে জমি বর্গাদারদের জমি দখলকারী সত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রক্রিয়া গতি পেয়েছে। আর প্রক্রিয়াটি জন্ম দিয়েছে বিস্তর প্রতিবন্ধকতা। ব্রাত্য জনগোষ্ঠী যত জাগছে, প্রতিরোধ ততো তীব্রতা পাচ্ছে।

গঙ্গাধর নিছক সন্ন্যাসী মাত্র নয়। সে এক মুক্তমনা, বন্ধনহীন এবং পরোপকারী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সমাজে। একটি ঘটনার সূত্র ধরে তার মনোভূমিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যায়। জমিতে চাষ করতে হাল-বলদ নিয়ে গ্রামেরই এক চাষী চাষ করতে মাঠে গিয়েছিল। তখন – "জমির মালিক এসেছে লোকজন নিয়ে তাকে হঠিয়ে দিতে। বর্গার রেকর্ড নাকি ঠিকমতো হয়নি। সে কোর্টে যাবে। ফয়সালা না হওয়া তক লাঙ্গল পড়বে না জমিতে।"[১১] গঙ্গাধর গোটা পরিস্থিতির সঙ্গে কখন যেন জড়িয়ে গেছে। এখানকার লোকজন গঙ্গাধরকে মান্য করে। তাই গঙ্গাধরের মুখের রায় শোনার উপরেই যেন অনেক কিছু নির্ভর করছিল।

যে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জন্য গঙ্গাধর সময় ব্যয় করছে, যাদের জন্য তার স্কুল তথা আশ্রম প্রতিষ্ঠা, তাদের পক্ষে রায় দেওয়াই ছিল অবধারিত। কিন্তু গঙ্গাধর ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী বর্গা চাষীরা জমি চাষ করে, সেখানে ভাগের ফসল তারা পায় মাত্র। সরকারীভাবে ভাগচাষীদের অধিকার যখন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তখন নেতা হিসেবে গতি অভিমুখী হবে গঙ্গাধর এটা তো আশা করাই যেতে পারে।

কিন্তু জমির মালিক যখন তার সামনে এসে বলল – "ঠাকুরমশাই এদের বোঝান না। রেকর্ডপত্রে গোলমাল আছে, কোর্টেই ফয়সালা হোক।"[১২] তখন ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে – "জমিত তাইনের আরঅ আছে। অইন্যগুলার রেকর্ড বুজি ঠিহাছে। ইডারই গুলমাল। অ্যাঁ।"[১৩] সবকিছু শুনেও গঙ্গাধর এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল যা দরিদ্র চাষীদের পক্ষে গেল না। গল্পকার তার গঠন পরিসরে সামাজিক

ইতিহাসকে উচ্চারণ করেছেন গল্পে। জমির উপর আধিপত্য বিস্তারের যে প্রয়াস তা চিরন্তন। সময়ের প্রেক্ষিতে দখলদারীদের কৃৎকৌশল শুধু নতুন স্বরূপে আবির্ভূত হয়। নিম্নবর্গীয় চাষীরাও বহুকাল এভাবে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে বারবারই দমন করার প্রয়াস চালিয়ে গেছে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা।

কালিপদ চক্রবর্তীর 'নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থের শেষ গল্প হল 'শেয়াল'। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত গল্পটিতে রচনাকালের উল্লেখ মেলেনি। গল্পকার অন্যান্য গল্পের মত এই গল্পটিতে দলিত মানুষের নির্যাতনের বহুমুখী সংগ্রামের একটি দিককে উদ্ভাসিত করেছেন। এই গল্পে নিম্নবর্গীয়দের চিহ্নিতকরণ কর্মটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। নিবারণ সংসারের জন্য শ্রম বিলায়। তীব্র প্রতিকূলতাকে প্রতিরোধ করতে কোমর বাঁধতে হয়। তার বেঁচে থাকার জন্য মোরগ পালন করাটা আবশ্যক। কিন্তু প্রতিবন্ধকতাও কম নয়। শেয়াল বেড়া ভেঙ্গে মোরগ খেয়ে যায়। ফলে হিসাবের ঘরে গরমিল হয়ে যায়।

নিবারণ অনুভব করে খাঁচার বেড়াটা মজবুত হওয়া দরকার। নইলে শেয়াল আবার আসবে। ধূর্ত শেয়াল নিঃশব্দেই আসে। বেড়াটা উঁচু করেই তোলা আছে। তবু কোন ফাঁকে সে তুলে নিয়ে যায় সবচেয়ে বড় মুরগিটা – "হয়তো দু'টি এসেছিল। একটির কাঁধে আরেকটি ভর দিয়ে বেড়া ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছে।"[১৪] এভাবে নিবারণের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙ্গে বিপদ চলে আসে ঘরের দরজায়। নিবারণকে ফাঁকি দিয়ে শেয়াল তার উদ্দেশ্য হাসিল করে। সে নিজেকে সামলাতে পারে না। মালতির উপরেই রাগটা ঢেলে দেয়।

নিবারণ জানে শেয়ালের লোভের থাবা অনেক লম্বা – "অতি ধূর্ত, কুৎসিত এই জীবটা। এমনকি মানুষের কচি বাচ্চাও সুযোগ পেলে ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরে তুলে নিয়ে যায়।"[১৫] একটু অসতর্ক হলেই শেয়াল সুযোগকে কাজে লাগায়। এখানে বারবার শেয়াল ভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে গল্পে আবির্ভূত হচ্ছে। এই শেয়াল হল ধূর্ত, কুৎসিত একটি জীব। বাস্তব সংসারেও মানুষ বেশধারী শেয়াল চরিত্রের লোক রয়েছে। নিবারণরা সামাজিক শোষণের চাপে এইসব শেয়াল গ্রুপের মানুষের হাতে ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব হয়ে যায়।

গল্পে একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা বরাবরই উচ্চ বর্গের সহকারী হিসেবে কাজ করে। সব সমাজেই এমন চরিত্রের অভাব নেই। এরা ভাঙ্গনের কাজে শক্তি যোগায়। এই গল্পে রয়েছে নিতাই চরিত্র। সে দালালের কাজ করে। জমির খবর মহাজনকে যোগান দেয়। মহাজন জমির মালিক কৌশলে কব্জা করে। নিতাইকে দেখে অপ্রসন্ন হয় নিবারণ। নিতাই এবার নিবারণকে জমি বিক্রি করার কথা বললে সে বলে – "আমি বেচুম না কইছি না।"[১৬] বিনোদের জমিরও তত্ত্বাবধান করেছে নিতাই। তাই শেষ অব্দি নিতাইয়ের হাত অবুঝের মত বিনোদ বলছে – "ট্যাহাডা দিলে জমিডা ফিরা পামু নি নিতাই?"[১৭]

নিতাইও জানে একবার মহাজনের খপ্পরে জমি চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না। বিনোদের আকুতি বিপন্নতার সুর নিতাইকেও নাড়া দিয়েছে। কিন্তু নিতাইও দুরন্ত মহাজনের খপ্পরে বন্দী হয়ে আছে। মহাজন জমি গ্রাস করার জন্য জাল বিস্তার করছে ক্রমশ। তাই নিতাই আবেগমথিত কণ্ঠে বলে – "নিবারণদা, জমি তুমরা কুন মতেই রাখতা পারতা না। আমারে তুমরা গিন্না কর, আমি দালালি করি, আমি লুকেরে ফুসলাই, কিন্তুক নিবারণদা, আমি না করলেঅ জমি তুমরার যাইবঅই। তুমরা জাননা এরা কত ষড়যন্ত্র করতে পারে।"[১৮]

নিতাইয়ের বিপন্নতা এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিতাই মহাজনদের জন্য খাটে। খাটতে বাধ্য হয়। সেও পাকচক্রে মহাজনদের কাছে বাধা পড়ে গেছে। এই চরিত্রটি মহাজনের পক্ষ অবলম্বন করলেও নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর বাইরে সে নয়। জীবনযুদ্ধের বহুমুখী স্বরূপটি গল্পকার অভিজ্ঞতার ভাষ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'শিয়াল' গল্পে নিম্নবর্গীয় নিবারণ একটি প্রতিবাদী চরিত্র। এই গল্পে এমন এক শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে, যারা নিজেদের পা রাখার জমিটুকু আগলে রাখতে গিয়ে নানাভাবে বিপন্ন হয়েছে। গল্পকার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে নিম্নবর্গীয়ের আগামী দিনের অন্ধকারের ইঙ্গিত দানের মধ্য দিয়েই গল্পটি শেষ করেছেন।

কালিপদ চক্রবর্তীর 'সময়ের হাত' গল্পটিতে নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনযুদ্ধ বাস্তবভূমি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রচনা করেছেন। প্রতিদিনকার সংসার পটে, তিল তিল অবক্ষয় এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাঠিন্যে ঘুরে দাঁড়াবার জন্য পরিকল্পিত সৃষ্টি করেছেন অবিনাশের মধ্য দিয়ে। সে সংসারযাত্রায় নিত্যদিনের ক্ষয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করে। অর্থনীতির বাস্তবতা মানুষকে কৃষ্ণগহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই সংসারে নিত্য যন্ত্রণা বেড়ে যায়। ভেঙ্গে যায় পারিবারিক শৃঙ্খলা।

সংসারের কাজে সবাই এগিয়ে এলে ভারসাম্যের ঘাটতি হয় না। কিন্তু তবু অবিনাশকেই দায়িত্ব নিতে হয় বেশি করে। সংসার ঠেলতে ঠেলতে বুনতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সংসারিক ঝগড়াও কম হয় না। ক্রমান্বয়ে সংসারের চেহারা প্রকাশ্যে আসতে থাকে। চারদিকেই কেমন অস্পষ্টতা অশুভ সময়ের কৃষ্ণ পাখা বিস্তারকে অনুভব করতে পারছিলো অবিনাশ। সময়ের ভাষ্য গল্পকার তুলে ধরেছেন এই গল্পে। অবিনাশ একসময় রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। এ হলো জীবন সংগ্রামের এক মাত্রা, যেখানে জৈবিক প্রয়োজনকে সম্পূর্ণতাদানই অভীষ্ঠ।

মানুষের ক্ষুধা এবং অভাবের সমান্তরাল এগিয়ে চলার মাঝে যখন একরাশ শৃঙ্খলাহীনতা জায়গা করে নেয় তখন ভেতরে ভেতরে কেউ কেউ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। অবিনাশের মধ্যে একটি সচেতন মন ও বিচারবোধ জেগে থাকে। তারই ভাঙাগড়া চলতে থাকে তার মনে। প্রতিনিয়ত এই যে রেশন দোকানে এত বড় লাইন পড়েছে এখানেও ভেতরের দিকে গোপনে চলছে আধিপত্যবাদীদের সুবিধা আদায়ের কাজকর্ম। মানুষ ছোট ছোট মন্তব্যে ভেতরের অবস্থাটি তুলেও ধরছিল মাঝে মধ্যে – "আরে দ্যাহেন গিয়া ভিতরে কি চলত্যাছে। হ' হ মুখ চিন্যা মুগেইর ডাইল ইডা আর জানিনা?"[১৯]

আসলে সবার প্রাপ্য তেল-নুন সুবিধাভোগী আধিপত্যবাদীদের কব্জায় চলে যাচ্ছে। অবিনাশও ক্রমশ সহিষ্ণুতা হারাচ্ছে। যে চেতনা তাকে প্রতিমুহূর্তে ভেতরে ভেতরে প্রতিবাদী করে তুলছিল আজও এমনই প্রতিবাদী সত্তা ভিতরে ভিতরে তাকে অস্থির করে তুলছিল। অবিনাশ হঠাৎ লক্ষ্য করে কাউন্টারের সামনে বেশ কিছু জায়গা জুড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। অবিনাশের পাশ থেকে একজন লোক ফিসফিস করে বলছে – "দেহখছেন, কান্ডটা দেহখছেন, লাইনে না দাঁড়াইয়াঅ কেমন হক্কলের আগে ন্যায়। অনিল কইতে গেছিল দিখ্যা তারে চড় মারছে। গুন্ডা।"[২০]

এরপরই আমরা দেখি অবিনাশের মধ্যে প্রতিবাদী সত্তা জেগে ওঠে। সংসারের নিত্যদিনের গঞ্জনা সততার দেয়াল ভেঙ্গে বেনোজলের মতো ঢুকে যাওয়া অসদাচার অবিনাশকে বিদ্রোহী করে তোলে। অবিনাশ নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনা – "দু-হাতে ভীড় ঠেলে, কিন্তু চোখ সামনে রেখে এগোতে এগোতে একসময় অবিনাশ দু-হাত বুকের কাছে জড়ো করে অকস্মাৎ লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ঠেলে দিয়ে বলে – ইয়ার্কি পাইছেন, যান, লাইন দ্যান গিয়া।"[২১]

একজন প্রতিবাদী মানুষ হিসেবে এখানে অবিনাশের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আসলে গল্পকার প্রতিবাদী মানসিকতাকেই পোষণ করেন। তার এই চেতনা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে বারবার বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নবর্গীয় মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণা তাদের জীবনকে দুর্বোধ্য করে রেখেছে। তাদের এই কঠিন জীবন সংগ্রামে বারবারই পরাজিত হতে হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবার এই নিম্নবর্গীয় মানুষগুলি নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিবাদ করেছে। তাই সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে রচিত 'সময়ের হাত' গল্পটি কালিপদ চক্রবর্তীর কাল চেতনার সাক্ষ্য বাহক অনবদ্য কথান্যাস।

নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনভাষ্যের রচয়িতা হলেন কালিপদ চক্রবর্তী। তাঁর গল্পে আমরা দেখতে পাই অস্তিত্ব রক্ষার বিচিত্রমুখী সংগ্রামের স্বরূপ। তিনি নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবন সংগ্রাম নিয়েই গল্প রচনা করেছেন। তিনি দায়বদ্ধ লেখক। তাঁর দায়বদ্ধতা প্রধানত নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের প্রতি। তাঁর কাছে সাহিত্যকর্ম সামাজিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গ। তিনি তাই বঞ্চিত মানুষদের মনে সাহস সঞ্চয় করার বাসনা নিয়েই কলম ধরেন। তাঁর মধ্যে কোন আপোষ নেই। কলম তাঁর কাছে প্রতিবাদের অস্ত্র। সেজন্য ত্রিপুরার সবচেয়ে নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর নির্বাক বেদনাকে ভাষা দিতে গিয়ে তাদের যন্ত্রণা এবং বঞ্চনাকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি এই সত্যকেও প্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্পে আমরা দেখি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হওয়ার পরেও তাঁর চরিত্ররা প্রতিবাদে, প্রতিশোধে, প্রতিরোধে জ্বলে উঠে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি নৈরাশ্যবাদী নন, তিনি আশাবাদী।

তথ্যসূত্রঃ

১) দাশ নির্মল, 'উত্তর-পূর্বের বাংলা ছোটগল্প বীক্ষণ – ২', পৃঃ ০৯।
২) পোদ্দার নির্লিপ, (সম্পাদিত), 'সত্তর দশকের নির্বাচিত গল্প', পৃঃ ৫৮।
৩) তদেব, পৃঃ ৫৭।
৪) তদেব, পৃঃ ৫৭।
৫) তদেব, পৃঃ ৫৭।
৬) তদেব, পৃঃ ৫৮।
৭) তদেব, পৃঃ ৫৯।
৮) দাশ নির্মল, 'উত্তর-পূর্বের বাংলা ছোটগল্প বীক্ষণ – ২', পৃঃ ১০।
৯) বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন (সম্পাদক), 'ত্রিপুরার ছোটগল্প সংগ্রহ' (১ম পর্ব), পৃঃ ২২।
১০) তদেব, পৃঃ ২২।
১১) তদেব, পৃঃ ২৪।
১২) তদেব, পৃঃ ২৫।
১৩) তদেব, পৃঃ ২৫।

১৪) নির্লিপ পোদ্দার, (সম্পাদিত), 'কালিপদ চক্রবর্তীর নির্বাচিত গল্প', পৃঃ ৫৪।
১৫) তদেব, পৃঃ ৫৭।
১৬) তদেব, পৃঃ ৫৭।
১৭) তদেব, পৃঃ ৫৭।
১৮) তদেব, পৃঃ ৫৮।
১৯) পোদ্দার নির্লিপ, (সম্পাদিত), 'সত্তর দশকের নির্বাচিত গল্প', পৃঃ ৬৩।
২০) তদেব, পৃঃ ৬৩।
২১) তদেব, পৃঃ ৬৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'ত্রিপুরার গল্প সংগ্রহ' (১ম পর্ব), বাংলা গল্প স্পন্দন, আগরতলা-১, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮।
২) নির্লিপ পোদ্দার, (সম্পাদিত), 'সময়ের দাগ ত্রিপুরার গল্পে', পৌনমী প্রকাশন, আগরতলা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮।
৩) ড. নির্মল দাশ, 'উত্তর-পূর্বের বাংলা ছোটগল্প বীক্ষণ-দুই', পর্ব ত্রিপুরা, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা-১, ১ম প্রকাশ, ২০১৩।
৪) নির্লিপ পোদ্দার, (সম্পাদিত), 'সত্তর দশকের নির্বাচিত গল্প', পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, ১ম প্রকাশ, ২০১৪।
৫)নির্লিপ পোদ্দার, (সম্পাদিত), 'কালিপদ চক্রবর্তীর নির্বাচিত গল্প', পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮।